**শ্রীচরেণেষু দাদা**

**পর্ব চার**

**একদিন অরুণের ফলাফল ঘোষণার দিনটি এলো।**

**সেটি ছিল এক বিস্ময়কর দিন দরিদ্র রাধেশ্যাম পরিবারের সকলের জন্য। অরুণ খবরটি পেয়েই উত্তেজনায় দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামের পানের বরজে পৌঁছায়। তাঁর বাবা তখন সেখানে কাজ করছিলেন। বাবাকে দূর থেকে দেখেই সে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো, "বাবা, আমি পাস করেছি!" বাবা তখন ক্লান্ত শরীরে কাজ করছিলেন। তার চোখে-মুখে দীর্ঘ পরিশ্রমের চিহ্ন। দূর থেকে অরুণের আনন্দিত মুখ দেখে রাধেশ্যাম প্রথমে কিছু বুঝতে পারলেন না। অরুণ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আবারো বলল, "বাবা, আমি পাস করেছি।" বলতে বলতে অরুণ বাবার সামনে দাঁড়ালো। জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। কপালে ঘামের চিহ্ন। চোখে-মুখে এক অন্যরকম উচ্ছ্বাস। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সেই উচ্ছ্বাসটা দমে গেল। তার গলা যেন আটকে গেল। বাবাকে দেখতে পেল বেশ ক্লান্ত। মাটির উপর ঘামে ভেজা কাপড় পরে কাজ করছিলেন। অরুণ কিছু না বলে বাবার হাতে ধরা কোদালটা নামিয়ে রেখে বাবার পায়ের কাছে বসে পড়লো। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই রাধেশ্যামের শরীর কেঁপে উঠল। অরুণ বললো, "বাবা, তুমি আর এই কষ্ট করতে হবে না।"**

**এই কথাটি শুনে রাধেশ্যাম থমকে দাঁড়ালেন। কিছু বলতে পারলেন না। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার সব রাতজাগা পরিশ্রম, ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগানোর জন্য সংসারের ন্যূনতম চাওয়া পাওয়া ভুলে যাওয়া। অরুণ বাবার পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। রাধেশ্যাম ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বললেন, "তুই পাস করেছিস, মানে আমিও পাস করেছি।" অরুণ ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, "বাবা, আজ তোমার কষ্টের ঋণ শোধ হলো। তুমি বলেছিলে, আমি পারবো। আমি পেরেছি বাবা!"**

**রাধেশ্যাম ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না চেপে বললেন, "তোর জন্যই আমার এই কষ্ট আজ সফল হলো। চল এখন বাড়ী চল।“**

**সেদিন তার বাবা-মার মুখে ছিল এক অদ্ভুত শান্তি। অরুণ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেছে। খবরটি শুনে মার চোখে জল এসে যায়। দুহাত কপালে ঠেকে দরজার উপরে আটকিয়ে রাখা শ্রী শ্রী রাম-ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। অরুণের মা ধরেই নিয়েছিল অরুণ পাস করবে না। পরীক্ষার সময় শরীর খুব অসুস্থ ছিল বলে অরুণের মা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাই পাস করার সংবাদটি শুনে বেশ আনন্দিত। সেদিন যেন এই দরিদ্র পরিবারটির সব দুঃখ-কষ্ট এক নিমেষেই মুছে যায়। স্বপ্নের প্রজাপতির পেখমের পত পত আওয়াজে ঘরটি মুখরিত হয়ে উঠল মুহূর্তেই। শুভ্র তখনো ঠিক মতো দাঁড়াতে শিখেনি।**

**অরুণদের বাড়িতে সেদিন অন্যরকম একটা পরিবেশ। মা অনেকদিন পর একটু ভালো রান্না করছেন। পাতিলে ফুটছে ভাত, আরেক পাশে ডাল আর তরকারি। ভাতের চালটুকু মায়ের জমিয়ে রাখা সঞ্চয় থেকে। এই চালটা তিনি অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করছিলেন কোনো বিশেষ দিনের জন্য। কিন্তু আজকের দিনটা তাকে খুব কাছের মনে হলো। অরুণ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবে, সেই আনন্দে তিনি ছেলেটার প্রিয় খাবার বানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মনের ভেতর ভারী এক অস্থিরতা। যেদিন থেকে অরুণ জানিয়েছে যে সে পলিটেকনিক কোর্স করতে চায়, মা তখন থেকেই চিন্তায় পড়ে গেছেন।**

**"এই খরচটা কিভাবে সামলাব আমরা?"—মনে মনে বারবার এই প্রশ্নটা ঘুরছে তার মাথায়। কিন্তু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কষ্ট ভুলে যান তিনি। মা জানেন, অরুণের স্বপ্ন তার কাছে অনেক বড়।**

**রাতে সবাই মাটির চৌকিতে বসে খাচ্ছিল। বাবার মুখে সেদিন একরকম সংকল্প দেখা যাচ্ছিল, আর অরুণের চোখে ছিল উজ্জ্বল আশা। খাওয়ার ফাঁকে বাবা হঠাৎ বললেন, "অরুণ, তুই বলেছিলি তোর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাস, পলিটেকনিক কোর্স করতে চাস। এটা করলে তোর ভবিষ্যৎ কেমন হবে। চাকরি-বাকরি জুটবে তো?"**

**অরুণ চোখে একটা দৃঢ়তা এনে বলল, "বাবা, পলিটেকনিক কোর্স করলে আমার জীবনে উন্নতির সুযোগ আসবে। একটা ভালো চাকরি পেতে পারব। আর তাড়াতাড়িও চাকরি পাওয়া যায়। তোমাকেও এই কষ্টের জীবন থেকে বেড় করে আনতে চাই, পরিবারকে একটা ভালো জীবন দিতে চাই। কিন্তু পলিটেকনিকে পড়াশুনায় খরচ কিছুটা বেশি।"**

**বাবা একটু খানি থেমে তার পাটভাঙা শার্টের বোতামগুলো খুলতে খুলতে বললেন, "আমাদের তো তেমন টাকা নেই, জানিস। একখণ্ড জমিটুকুই সব। যা রোজগার করি তাতেই যে সংসার চলে না। কিন্তু পড়াশোনা যে জীবন বদলে দিতে পারে, তাও জানি। তুই পড়াশোনা করলে আমার জীবন আর তোর জীবনের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি ন। কিভাবে এতো টকা-পয়সা যোগার করবো।"**

**মা পাশ থেকে অসহায় বাবার কথাগুলো শুনছিলেন আর পাণ্ডুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন,কীভাবে হবে? যে জমিটুকু আছে, সেটাই তাদের বাঁচার শেষ অবলম্বন। এই জমিটুকু বিক্রি করলে যে বেঁচে থাকার আর কোন উপায়ই থাকবে না। সবাইকে নিয়ে যে পথে বসতে হবে। এ সব ভাবতে ভাবতে অরুণের মায়ের মাথা যেন গুমোট হয়ে আসে। চিন চিন ব্যথা অনুভব করে।**

**কিন্তু পরক্ষনেই তার ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সব চিন্তাই যেন ম্লান হয়ে যায়। মা কিছুক্ষণ চুপ থেকে মৃদুস্বরে বললেন, "জমিটুকু বিক্রি করে দাও। ওর ভবিষ্যতটাই তো সবচেয়ে বড়।"**

**বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি জানতেন, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত, কিন্তু সেই জমির সঙ্গে তার পিতৃপুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে। তবু, অরুণের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে দৃঢ়তা আনলেন। "আগামীকাল জমি বিক্রির ব্যবস্থা করব," কথাটা এমনভাবে বললেন, যেন নিজের মনকে প্রস্তুত করছেন।**

**অরুণ চুপচাপ শুনছিল, চোখে জল এসে গেল। বাবা-মা এত বড় ত্যাগ করতে যাচ্ছেন তার জন্য। মনের ভেতর থেকে একটা কষ্টের অনুভূতি আসলেও, সেই কষ্টের আড়ালে লুকানো ছিল অদম্য ভালোবাসা আর স্বপ্ন।**

**মা তখনও ভাবছেন, কেমন হবে অরুণের ভবিষ্যৎ? যুদ্ধের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, কিন্তু ছেলেটার মুখে এক আলোকিত স্বপ্নের আভা। মনে মনে ভাবতে থাকেন-“শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবে তো”?**

**পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে অরুণ। তবে ভর্তি ফি এবং বইপত্রের জন্য টাকা কোথায়? অরুণের বাবা, একজন দরিদ্র কৃষক, জানতেন শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। কিন্তু সামান্য জমিটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের। জমিটা ছিল পূর্বপুরুষদের একমাত্র অবশিষ্ট ধন। তবু, সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তিনি দ্বিধা করলেন না। ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন না। যে সংসারের সকলেই থাকে অনাহারে-অর্ধাহারে, সপ্তাহে যেখানে একদিনও ভালো করে পুরো পেট ভরে ভাত খেতে পারে না সেই সংসারের অধিকর্তা সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে দিবেন। ছেলের ভবিষ্যতের জন্য এইটুকু করা ছাড়া যে দরিদ্র রাধেশ্যামের কোন উপায় নেই।**

**তাই এক সকালে, বাবা সেই জমিটুকু বিক্রি করে দিলেন। সেই জমি, যেটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের কাছে ছিল। এই জমিটুকুর উপরই সংসারের অনেকটাই নির্ভর ছিল। মা, চুপ করে বসে ছিলেন এক কোণে, চোখের জল মুছছিলেন আড়ালে। অরুণ বোঝে, এই ত্যাগ তার জন্য কত বড়। কিন্তু বাবার চোখে ছিল দৃঢ় সংকল্প। "জমি ফিরিয়ে পাওয়া যাবে, কিন্তু শিক্ষা না থাকলে, কিছুই থাকবে না," বাবা বলেছিলেন।**

**অরুণ ভর্তি হলো পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে।**

**এটাই ছিল তার স্বপ্ন-পূরণের প্রথম ধাপ। তবে শহরে এসে পড়াশোনা করা যে এত কঠিন হবে, তা সে আগে বুঝতে পারেনি। একেবারে নগণ্য টাকা নিয়ে শহরে পা রেখেছিল সে। বাবা জমির শেষ টুকরো বিক্রি করে যে সামান্য টাকা দিয়েছিলেন, সেটা দিয়ে প্রথম কয়েক মাসের খরচ সামাল দেওয়া গেল। কিন্তু তারপর?**

**অরুণের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল শহরের এক কোণায়, ছোট্ট একটা বাড়ির এক ঘরে। সেখানে সে থাকত আরও চারজন বন্ধু সহপাঠীর সঙ্গে। ঘরটা খুবই ছোট, চারপাশে দেয়ালের প্লাস্টার উঠে গিয়েছিল। সবসময় একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব, জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকত খুব কিপটে করে। পাশেই জানালার গা ঘেঁষে একটা বাড়ী। জানাল দিয়ে আকাশ যেতো না। ঘরটাও খুব ছোট। ঘরে একটা মাত্র খাট। অরুণ আর এক সহপাঠী খাটেই আর বাকি সবাই মেঝেতেই চাটাই পেতে শুত। তারা সবাই গ্রামের ছেলে, প্রত্যেকেই অরুণের মতোই অর্থকষ্টে ভুগছিল। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই সবার মধ্যে একটা ভাব জমে যায়। তাদের দেখলে মনে হতো, কষ্টের মুহূর্তেই বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়।**

**খাবারের জন্য সবাই মিলে প্রতিদিন একটু একটু করে টাকা জমাত। পালা করে রান্নার দায়িত্ব নেওয়া হত—একদিন অরুণ, পরের দিন কেউ অন্যজন। অনেক সময় ডাল আর ভাতেই দিন কেটে যেত, কখনও তেলের অভাবে তরকারিতে শুধুই লবণ আর হলুদ দিয়ে রান্না হত। তবুও তারা খুশি ছিল। এই ছোট ছোট ত্যাগগুলো যেন ভালোবাসার এক মধুর অভিজ্ঞতা, যা তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের পথকে মসৃণ করছিল। তারা জানত, এটাই তাদের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।**

**তবে সকলের মধ্যে অরুণের পরিস্থিতি ছিল বেশ নাজুক। পকেটে এত কম টাকা থাকত যে, প্রতিদিনের খরচের জন্য তাকে প্রতিটি মুহূর্তে হিসাব কষতে হত। সামান্য বেশি খরচ করার সুযোগই ছিল না। একটি মাত্র ট্রাউজার আর একটি শার্টে দিন চলছিল তার। পায়ে থাকা স্যান্ডেলটিতেও ছিল অনেকগুলো সেলাই। ঠিক তখনই অরুণ একটি টিউশনি খুঁজে পেল। শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছোট মেয়েকে পড়ানোর কাজ শুরু করল সে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেই বাড়িতে গিয়ে পড়াত। মেয়েটির পড়া শেষ হলে, অরুণকে সেখানে খাবার খেতে দেওয়া হত। সেই খাবারই ছিল তার কাছে এক বড় সঞ্চয়, কারণ এতে করে তার রাতের খাবারের খরচ বেঁচে যেত।**

**বাড়ি থেকে বহু দূরে, এই অচেনা শহরে, অরুণের দিনগুলো কাটছিল এক গভীর কষ্ট আর নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে। প্রতিটি দিন যেন নতুন একটি চ্যালেঞ্জ। সকালে ক্লাস, তারপর ছুটে যাওয়া টিউশনি করতে, আর রাতে ফিরে ক্লান্ত শরীরে বন্ধুরা মিলে সামান্য খাবার রান্নার চেষ্টা। বিদ্যুৎ কখনও থাকত, কখনও থাকত না। লোডশেডিং যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এমন সময়ে মোমবাতির মলিন আলোই ছিল তার পড়াশোনার একমাত্র ভরসা। টিউশনির সামান্য আয়ে নিজের প্রয়োজন মেটানো ছিল এক অসম্ভব সাধনা। প্রয়োজনীয় বইপত্র কেনার আগে তাকে বারবার ভাবতে হত—কোনটা বেশি জরুরি। অনেক সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছেটাকেই ত্যাগ করতে হত। সেই অল্প টাকায় কখনও মেসের জন্য চাল, ডাল কিনে আনত, আবার কখনও নিজের জন্য একটি পুরনো বই। তার মনেও একটি চাপা যন্ত্রণা ছিল—এই শহরে কারও কাছে সে যেন আপন কেউ নয়। এক নিঃসঙ্গ, অথচ লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এক পথিক। কষ্টের মধ্যেও অরুণ জানত, এই সংগ্রাম তার ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু প্রতিটি দিন শেষ হলে মনে হত, এ লড়াইয়ের শেষ কোথায়? অন্ধকার ঘরে মোমের আলোতে নিজের ক্লান্ত মুখটা দেখে মাঝেমধ্যে চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ত। তবুও সে থেমে থাকেনি, কারণ তার কাছে প্রতিটি সংগ্রামের অর্থ ছিল তার স্বপ্ন-পূরণের এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।**

**পলিটেকনিকের কঠিন কোর্সগুলোতে অরুণ প্রতিদিন নতুন কিছু শিখত, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিদিন নতুন এক দুশ্চিন্তা এসে দাঁড়াত তার সামনে—আগামীকাল কীভাবে খরচ চলবে? এতকিছুর মাঝেও অরুণ হাল ছাড়েনি। বন্ধুরা মাঝে মাঝে হালকা রসিকতা করত, "অরুণ, তুই তো ধনী লোকের বাড়ি টিউশনি করিস, তোর তো বড়লোকি অভ্যাস হয়ে যাবে!"**

**অরুণ হাসত, কিন্তু তার চোখে এক অদম্য ইচ্ছার ঝলক ছিল। সে জানত, এই কষ্টের দিনগুলো অস্থায়ী। তার সামনে যে ভবিষ্যৎ, সেটা তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই।**

**কঠোর পরিশ্রমে শুরু হলো তার নতুন জীবন। তবে এক বছরের মধ্যেই সবকিছু পাল্টে যেতে লাগল। ১৯৭১ সাল, যুদ্ধের আগমনী বার্তা যেন বাতাসে ভাসছিল। দেশ স্বাধীনতার জন্য জেগে উঠছে। হঠাৎ করেই একদিন অরুণের পড়াশোনা থেমে গেল। দেশ যেন অশান্ত হয়ে উঠলো। চারিদিকে শুধু হট্টগোল। ফিস ফিস, ফাঁস ফাঁস চাপা কণ্ঠের আওয়াজ চারিপাশে। সবাই আস্তে আস্তে শহর ছেড়ে গ্রামে ছুটছে। শহর অঞ্চলে এরই মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়।**

**শহরের চারপাশে তখন এক অদ্ভুত আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে। দিন দিন উত্তেজনা বাড়ছে, মানুষের মুখে শুধু স্বাধীনতার কথা। পলিটেকনিকের ছাত্ররা ক্লাসের বাইরে বসে মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা করত, সবার চোখে যেন একরকম তেজ ছিল। অরুণও প্রতিদিন শুনত তাদের কথা। কারও ভাই যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, কারও বাবা গ্রামে লড়ছে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু অরুণের মন পড়ে থাকত তার পরিবারের দিকে—তাদের কি হবে? তার ছোট বোন, যে তখন চট্টগ্রামের কাকার বাড়িতে আছে। তার কি হবে?**

**অরুণের বন্ধুদের সঙ্গে সেই ছোট্ট বাড়িতে পড়াশোনার দিনগুলো যেন হঠাৎই খুব দূরের মনে হতে লাগল। রাতের অন্ধকারে সবার ঘুম ভাঙত গুলির আওয়াজে। বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল ভয়ের গন্ধে। অরুণ অনেকবার ভেবেছিল, "বোনকে ফিরিয়ে আনব কবে?" কিন্তু চট্টগ্রামে যাওয়া সেই সময় অসম্ভব ছিল। পাকবাহিনীর অবরোধে সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে।**

**এক সন্ধ্যায় তারা সবাই মিলে যখন রান্না করছিল, তখন একজন বন্ধু হঠাৎ বলল, "এইভাবে আর কতদিন? শহরটা নিরাপদ নয়। আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে।"**

**অরুণের ভেতরেও সেই একই চিন্তা ঘুরছিল। সে তার মা-বাবার মুখ ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল। বাড়ি ফিরে গেলে নিরাপত্তা থাকবে কি না, তাও জানে না, কিন্তু শহরে থাকা মানে মৃত্যুর ঝুঁকি। প্রতিটি দিন যেন ঘন কালো মেঘের মতো, অজানা ভয়ে ঢেকে যাচ্ছে।**

**অবশেষে একদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়, বাড়ি ফেরা। অরুণ আর তার বন্ধুরা রাতের আঁধারে বাড়ির পথ ধরল। যান বাহন যেন থুবড়ে পড়েছে। আতংকে সব কিছুই বন্ধ। শহরে কোন বাস কিংবা বেবি ট্যাক্সি নাই বললেই চলে। অলিতে গলিতে ফাঁকা রিক্সাগুলি টুংটাং আওয়াজ তুলে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলছে। কেউ কেউ দুএক জন প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়েছেন। দুই একটা মালবাহী গরর গাড়ী অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলছে। রাস্তা ঘাটে তেমন ব্যস্ততা নেই। যেন চারিদিকে এক নিস্তব্ধ শোকের ছায়া। থম থমে ভাব চারিদিক।**

**অগত্যা হেঁটেই রওনা দিলো। গ্রামে যেতে প্রায় পনের-ষোল মাইল হাঁটতে হবে।**

**ক্লান্তি, ক্ষুধা আর ভয়ের মাঝেও তারা চলতে থাকল। অরুণের মনে শুধু একটাই প্রশ্ন—বোনকে কীভাবে ফিরিয়ে আনবে? চট্টগ্রামের রাস্তাগুলো অবরুদ্ধ, সেখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।**

**গ্রামে ফিরে এসে অরুণ দেখল, তার বাবা-মা ইতোমধ্যে প্রায় সবকিছু গুছিয়ে রেখেছে। তারা জানত, এই যুদ্ধ থেকে বাঁচতে হলে দেশ ছেড়ে পালানোই একমাত্র পথ। কিন্তু মেয়েটাকে ফেলে কীভাবে যাবে? মা’র চোখে জল, বাবা চুপচাপ বসে ছিলেন, যেন কোনও গভীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। "তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব," বাবা বলেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে উঠেছিল যে তা আর সম্ভব হলো না।**

**অরুণ বুঝতে পারলো দেশ আজ আক্রান্ত। তার চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার দেখে চমকে উঠে মাঝে মাঝে। খুব অস্থির মন।। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে মন চাইল। বন্ধুরা একে একে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দিচ্ছে। অরুণও চেয়েছিল যেতে, দেশের জন্য কিছু করতে। কিন্তু মা-বাবা তাকে বাধা দিলেন। তারা জানতেন, ছেলে যুদ্ধে গেলে বেঁচে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই।**

**"আমরা তোকে হারাতে পারব না," মা কান্নাভরা কণ্ঠে বললেন। বাবা চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন, যেন ভেতরে ভেতরে ছেলেকে যেতে দিতে চান, কিন্তু বাবা হিসেবে তিনি আটকিয়ে ছিলেন।**

**এক গভীর রাতে, সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। কেবল দূরের আকাশে ভেসে আসা গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, যেন যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা তাদের নিঃশ্বাসের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। অরুণের মা বললেন, "আর এক মুহূর্ত দেরি করলে আমাদের কেউই বাঁচব না।" সেই কথাগুলো যেন এক অশ্রুত শপথের মতো তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত হল। সেদিন রাতে তাদের বাড়ির সব আলো নিভে গেল। অন্ধকারে, চুপিসারে, তাঁরা দেশ ছেড়ে পালানোর প্রস্তুতি নিলেন।**

**অরুণের মনে অস্থিরতা। বোনকে ফেলে যাওয়ার চিন্তা তার হৃদয়কে যেন টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল শৈশবের দিনগুলো—যখন বোনের হাসি ছিল তার সমস্ত ক্লান্তি দূর করার অব্যর্থ ওষুধ। কিন্তু যুদ্ধের কঠোর বাস্তবতা আর বেঁচে থাকার তাগিদ তাদের জন্য আর অন্য কোনো পথ ছিল না। ভোরের আলোর এক ফোঁটা আভা এখনও আকাশে দেখা যায়নি। তারা নীরবে নদীর ঘাটে এসে পৌঁছায়। অরুণ একবার পেছনে তাকাল—তার শৈশবের পরিচিত বাড়ি, খেলার মাঠ, আর সেই প্রিয় বোন। কিন্তু আজ সেই চেনা দৃশ্যগুলো তার জন্য শুধুই এক দুঃসহ স্মৃতির ভার। দেশ ছেড়ে যাওয়া মানে শুধু মাটি, জমি বা বাড়ি ত্যাগ করা নয়, বরং ত্যাগ করা তাদের হাসি, কান্না, ভালোবাসা আর জীবনযাপনের এক অনন্য অধ্যায়।**

**মুক্তিযুদ্ধের ধ্বনি তখন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি শ্বাস যেন ভয়ে, প্রত্যাশায় এবং বেদনার সাথে মিশে আছে। অরুণের চোখে জল। বাবার পিছু নীল সে, কিন্তু তার মনে হাজারো প্রশ্ন। "স্বাধীনতা কি সত্যিই আমার এই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে?" দেশ একদিন মুক্ত হবে, কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে সোনালি সময়, তার ছোটবেলার খেলা, তার শিক্ষার স্বপ্ন আর প্রিয় বোনের সঙ্গ, সবকিছু সময়ের অন্ধকারে মিশে গেল।**

**নদীর বুকে নৌকা ভেসে চলল, আর অরুণ অনুভব করল যে শুধু তাদের শরীর নয়, তাদের আত্মাও যেন এই মাটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। স্বাধীনতার মশাল হয়তো একদিন জ্বলবে, কিন্তু সেই মশালের আলোতে তার ব্যক্তিগত স্মৃতির অন্ধকার দূর হবে কি?**

**হঠাৎ মাঝির বৈঠার টানায় জলের ছলছল শব্দ ভেদ করে অরুণের কানে এক গভীর শূন্যতার মতো আছড়ে পড়লো এক হৃদয়বিদারক আওয়াজ। নৌকার এক কোণে নীরব মূর্তির মতো বসে থাকা তার মা, যিনি এতক্ষণ একদম চুপ ছিলেন, হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মনে হচ্ছিল, যেন হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা একত্রে প্রকাশিত হলো সেই কান্নায়। অরুণ অবাক হয়ে চুপচাপ শুনতে লাগলো—নৌকার পরিবেশের নিস্তব্ধতা যেন তার মায়ের কান্নার তীব্রতায় কাঁপতে শুরু করল। নৌকার দুলুনি আর জলের মৃদু শব্দের মাঝে এই কান্না যেন এক গভীর বেদনার প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল।**

চলবে—পর্ব ৪)

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট

Bottom of Form